মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৪র্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, আগস্ট ২০২৩

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশের আদর্শিক পটপরিবর্তন: প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিশেষ আয়োজন একক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে এবছর বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সভাপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন। 'বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশের আদর্শিক পটপরিবর্তন : প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া' বিষয়ক আলোচনায় তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ, মানুষে মানুষে সহমর্মিতা, মানবাধিকার বঙ্গবন্ধুর জীবনের লক্ষ্য ছিল। যে সংবিধান প্রণয়ন করতে পাকিস্তান সরকারের নয় বছর সময় লেগেছিল মাত্র এক বছরের মধ্যে তিনি জাতিকে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই চার মূলনীতি সম্বলিত সংবিধান উপহার দেন। বাঙালি যখন মাত্র সাড়ে তিন বছরে আত্মনির্ভরশীলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ঠিক সে সময় কুচক্রীরা তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। দেশকে অগ্রগতির বিপরীতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী ও আদর্শহীনতার উপকরণ যুক্ত করে পাকিস্তানি মডেলে উল্টো দিকে দেশ চালাতে থাকে। তিনি উল্লেখ করেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা ও তাঁর সরকারের উৎখাতের পর তাঁর মন্ত্রিসভার বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা গ্রহণ করে ওই দিনই জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বক্তৃতায় মুসলিম বিশ্বসহ সকল দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং 'খোদা হাফেজ' ও 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' বলে বক্তৃতা শেষ করেন। তাঁর ক্ষমতাগ্রহণ এবং তাঁর উত্তরসুরী জেনারেল জিয়াউর রহমানের সময় আদর্শিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়। বাঙালিকে একত্রিত করেছিল যেই শ্লোগান শুরুতেই মোশতাক সরকার 'জয় বাংলা' শ্লোগানের বদল করলো, বাংলাদেশ বেতারের নাম পাকিস্তানের অনুকরণে 'রেডিও বাংলাদেশ' করা হলো। ২৮ আগস্ট সামরিক আদালত গঠন করা ছাড়াও দুটি সিদ্ধান্ত পাকিস্তান ও পাকিস্তানপন্থিদের জন্য সুখবর বয়ে আনে। প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতা ও জঘন্য অপরাধে অভিযুক্ত, নাগরিকত্ব বাতিলকৃত ৪৩ জনের মধ্যে ৯ জনকে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে দালালদের পুনর্বাসনের সূচনা করা হয়। দ্বিতীয়ত, নিষিদ্ধ ঘোষিত জামায়াতে ইসলামি, মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলামির একটি প্রতিনিধি দল মোশতাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং এর মাত্র দু'দিন পর তারা নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে ধর্মভিত্তিক দল গঠন, দালাল আইনে আটকদের মুক্তি ও গোলাম আযমসহ প্রবাসে অবস্থানকারী দালালদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দাবি করে। জিয়া নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করেন। বহু মুক্তিযোদ্ধাকে প্রহসনের বিচারে হত্যা করেন। বিভিন্ন অজুহাতে সশস্ত্র বাহিনী থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের বড় অংশকে অপসারণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতার কারণে নাগরিকত্ব বাতিলকৃতদের অনেকে ১৯৭৬ সালেই নাগরিকত্ব ফিরে পান এবং ধর্মভিত্তিক দলগুলোকে

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আইএজিএস বার্সেলোনা সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিনিধিত্ব

বাংলাদেশের গণহত্যা বিষয়ক প্যানেল আলোচনা

গত ১০-১৪ জুলাই স্পেনের বার্সেলোনায় ইন্টারন্যাশনাল এসোশিয়েসন অব জেনোসাইড স্কলারস (আইএজিএস) এবং ইউনিভার্সিটি অব বার্সেলোনার আইন অনুষদের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে আইএজিএসের ষোড়শ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন। এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল 'অথোরিটারিয়ানিজম এন্ড জেনোসাইড: ন্যারেটিভস অব এক্সক্লুশন'। প্রায় চল্লিশটি দেশের ২৮০ জনের বেশী জেনোসাইড স্কলারস এই সম্মেলনে তাদের গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। জাতিসংঘের স্পেশাল এডভাইজার অন দ্য প্রিভেনশন অব জেনোসাইড এলিস ওয়াইরিমু নিরেতু সম্মেলনে 'হেট স্পিচ এন্ড এটরোসিটি ক্রাইমস' বিষয়ে বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। 'কোয়ান্টিফাইং জেনোসাইডাল ইন্টেন্ট: এন অবজেক্ট লেসন ইন ইম্প্রুডেন্স?' বিষয়ে আরেকটি বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)-এর সাবেক বিচারক চিলে এবো-ওসুজি।

আইএজিএসের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য হিসেবে প্রতিবারের মতোই বাংলাদেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গবেষকেরা আইএজিএসের এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এইবারের আয়োজনে জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)-এর দুইটি প্যানেল প্রস্তাব সম্মেলনে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন পায়।

প্রথম প্যানেলের বিষয়বস্তু ছিল 'চ্যালেঞ্জেস টু ফাইট এগেইন্সট হেট স্পিচ ইন দ্য আইস অব বাংলাদেশি ইয়াং রিসার্চারস'। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হকের সভাপতিত্বে এই প্যানেলে গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিএসজিজে'র তরুণ তিন গবেষক মেহজাবিন নাজরানা, তাবাসসুম নিগার ঐশী, এবং তাবাসসুম

ইসলাম তামান্না। মেহজাবিন নাজরানা আলোচনা করেন 'মিডিয়া ইনসাইটমেন্ট টু জেনোসাইড', তাবাসসুম নিগার ঐশী 'কনটেমপোরারি হেট স্পিচ ক্যাম্পেইন এগেইন্সট দ্য রিলিজিয়াস মাইনরিটিস ইন বাংলাদেশ', এবং তাবাসসুম ইসলাম তামান্না 'ল সু এগেইন্সট মেটা (ফেসবুক) ফর প্রমোটিং হেট স্পিচ এগেইন্সট দ্য রোহিঙ্গাস' বিষয়ে। ভিসা সংক্রান্ত জটিলতায় তিন গবেষক বার্সেলোনায় সশরীরে উপস্থিত হতে না পারলেও, তারা অনলাইনে

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

৯৮তম জন্মবার্ষিকী | তাজউদ্দীন আহমদ স্মরণানুষ্ঠান

গত ২৩ জুলাই ছিল মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী, এ উপলক্ষ্যে ২৪ জুলাই সোমবার বিকেল ৫টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সেমিনার কক্ষে স্মরণানুষ্ঠন আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ কন্যা সিমিন হোসেন রিমি এমপি, তাজউদ্দীন আহমদ-কে নিয়ে রচিত উপন্যাস 'সাক্ষী ছিলো শিরস্ত্রাণ'-এর লেখক সুহান রিজওয়ান এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী। 'সাক্ষী ছিলো শিরস্ত্রাণ' উপন্যাস থেকে রণাঙ্গনের ঘড়ি অংশটি বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী অনন্যা লাবনী পুতলের পাঠের মধ্য দিয়ে স্মরণানুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী তার সূচনা বক্তব্যে বলেন, "তাজউদ্দীন সম্পর্কে ড. আনিসুজ্জামানের একটি গল্প দিয়ে শুরু করছি। একদিন ভোর বেলা দেখি তাজউদ্দীন সাহেব খুব উষ্কখুষ্ক চেহারায়। আনিসুজ্জামান জিজ্ঞেস করলেন আপনার কি শরীর খারাপ? দেখে মনে হচ্ছে ঘুমাননি বুঝি! তাজউদ্দীন জানালেন, কাল রাতে খুব ঝড় হয়েছে, আমি তো দালান কোঠায় থাকি, এই ঝড়বাদলে মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীরা তো ঘুমাতে পারছে না, এসব ভেবে আমারও রাতে ঘুম হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ অন্তপ্রাণ তাজউদ্দীন এমন একজন মানুষ। আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল পর্যায়ে তাজউদ্দীন আহমদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর পাশাপাশি তাজউদ্দীন আহমাদ-এর কর্ম-জীবনের উল্লেখ ছাড়া বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস রচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। এই বিবেচনা থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিবছর জন্মদিনে তাঁকে স্মরণ করে। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের সূচনা থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে বঙ্গবন্ধুর এই ঘনিষ্ঠ সহচর গণতন্ত্র ও বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছেন। বঙ্গবন্ধু ধাপে ধাপে স্বাধিকার আন্দোলন থেকে দেশবাসীর মধ্যে স্বাধীনতার আকাংক্ষা জাগ্রত করেছেন, এর সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তাজউদ্দীন আহমদ। তবে স্বল্পবাক তাজউদ্দীন আহমদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাংগঠনিক গুণাবলীর অতুলনীয় পরিচয় পাওয়া যায় মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার পরিচালনায়। তাঁকে একদিকে মার্কিনপন্থী খন্দকার মোস্তাক গং এবং তরুণ ছাত্র ও যুবনেতাদের বিরোধীতার মধ্য থেকে কাজ করতে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তিনি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা, শরণার্থীদের ত্রাণ সংগ্রহ, সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি ও বিদেশী সমর্থন অর্জন করে দেশকে বিজয়ের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন। ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এর ভাষণে তিনি বলেন, *পিতা বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে আমি এক ধাত্রীর ভূমিকা পালন করেছি মাত্র।* মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং বাংলাদেশকে একটি স্বনির্ভর দেশ হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন তিনি দেখেছেন। কিন্তু তাঁর আমৃত্যু নেতা বঙ্গবন্ধুর সাথে বিচ্ছিন্নতার মূল্য দেশকে দিতে হয়েছে। ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ মানবতা বিবর্জিত জেলহত্যার মধ্যদিয়ে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। এবছর আমরা তাঁর ৯৮তম জন্মবার্ষিকী পালন করছি, আমাদের প্রত্যাশা কৃতজ্ঞ দেশবাসী আগামী ২০২৫ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষ পালন করবে।"

তাজউদ্দীন আহমদ ছাত্রজীবন থেকে আমৃত্যু ডায়েরি লিখে গেছেন, তাঁর সুযোগ্য কন্যা সিমিন হোসেন রিমি'র সম্পাদনায় সে সব ডায়েরির অনেকগুলোই প্রকাশিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ১৯৫৪ সালে লেখা তাঁর ডায়েরির পাতা থেকে ২২ এপ্রিল, ৩০ এপ্রিল ও ১ আগস্টের দিনলিপি পাঠ করেন আবৃত্তি শিল্পী মহিউদ্দিন শামীম।

এরপর তাজউদ্দীন আহমদ-কে নিয়ে রচিত উপন্যাস 'সাক্ষী ছিলো শিরস্ত্রাণ'-এর লেখক সুহান রিজওয়ান তার আলোচনায় বলেন, এই উপন্যাস লেখার সূত্রে একটা উল্লেখযোগ্য সময় আমি তাজউদ্দীনের সাথে যাপন করেছি এবং করছি, সেই সূত্রেই আজকের যতো কথা বলা। আমি কথা বলবো মূলত দুটি বিষয় নিয়ে, প্রথমত আমি কীভাবে তাজউদ্দীনকে আবিষ্কার করেছি এবং দ্বিতীয়ত আজকের বাংলাদেশে আমরা তাজউদ্দীন আহমদকে কোথায় খুঁজে পেতে পারি। আমার এবং আমার মতো আরও অনেকের শৈশবে তাজউদ্দীন-এর নাম আমরা পাইনি ইতিহাসের পাতায়। বুয়েটে পড়ার সময় আমি বঙ্গবন্ধুবের সূত্রে নানারকম বই পড়ার সুযোগ পাই। এমনি সময় আমি প্রথম তাজউদ্দীন আহমদের নাম জানি। অন্তত দুটি বিষয়ে তাজউদ্দীন আহমদ-এর প্রতি সকলে একমত পোষণ করতে দেখেছি, এক. দেশের ক্রান্তিলগ্নে তার অবস্থান ও দুই. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি তাঁর আনুগত্য। আমি দেখতে পাই তিনি আমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার বারবার মনে হয়েছে তাজউদ্দীনের পরিণতি কেন এমন হলো। সেটার সোজাসুজি উত্তর পাওয়া হয়তো সম্ভব না। জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার কথা ছিল যে বাংলাদেশে, সে বাংলাদেশে আজকে তিনি থাকলে কি করতেন? আজকের যে মানুষটি বৈশ্বিক একটা জায়গা থেকে বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে চায় তাজউদ্দীন এখনও তাঁর মাঝে আছেন। আজও বাংলাদেশে প্রথার বিরুদ্ধে ও সংস্কারের পক্ষে যদি কেউ একলা হয়ে যায় তাঁর মধ্যে তাজউদ্দীনকে খুঁজে পাওয়া যাবে। আমি উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে দেখি একজন বঙ্গবন্ধু এবং একজন তাজউদ্দীন কতো বড় মাপের মানুষ। তাজউদ্দীন নিজেকে রূপান্তর করেছিল সমগ্র বাংলাদেশে। এরপর সীমান্ত গান্ধীখ্যাত খান আব্দুল গাফফার খানকে লেখা তাজউদ্দীন আহমদের লেখা ১৯৭১ সালের একটি চিঠি পাঠ করেন স্মরণানুষ্ঠানের সঞ্চালক রফিকুল ইসলাম। তাজউদ্দীন আহমদের লেখা ও তাঁকে লেখা আরও অসংখ্য চিঠির মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর লেখা বাংলাদেশের স্বীকৃতি সম্পর্কিত চিঠিসহ কয়েকটি চিঠি পাঠ করেন বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী সৈয়দ শহীদুল ইসলাম নাজু। সবশেষে বক্তব্য প্রদান করেন তাজউদ্দীন-কন্যা সিমিন হোসেন রিমি এমপি, তিনি তার বক্তব্যে বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিবছর তাজউদ্দীন আহমদকে স্মরণ করে আসছে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে, আমি আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাজউদ্দীন আহমদ কেমন বাংলাদেশ চেয়েছিলেন সেটা আমরা পেতে পারি তাঁর বক্তব্যের মধ্যে যেটা তিনি ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সরকার গঠনের পর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রদত্ত ভাষণের একদম শেষের দিকে বলেছেন, '*বাংলাদেশের নিরন্ন দুঃখি মানুষের জন্য রচিত হোক এক নতুন পৃথিবী, যেখানে মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক ক্ষুধা, রোগ, বেকারত্ব আর অজ্ঞানতার অভিশাপ থেকে মুক্তি*-এ পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত সাড়ে সাত কোটি বীর বাঙালি ভাই-বোনের সম্মিলিত মনোবল ও অসীম শক্তি। যারা আজ রক্ত দিয়ে উর্বর করছে বাংলাদেশের মাটি, যেখানে উৎকর্ষিত হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন মানুষ, তাদের রক্ত ও ঘামে ভেজা মাটি থেকে গড়ে উঠুক নতুন গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। গণমানুষের কল্যাণে সাম্য আর সোচ্চারের ভিত্তিপ্রস্থরে লেখা হোক জয় বাংলা, জয় স্বাধীন বাংলাদেশ।'

-শরীফ রেজা মাহমুদ

হিরোশিমা দিবসের আয়োজন

শান্তির সপক্ষে আমরা

৭ আগস্ট ২০২৩ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আঙ্গিনা সেজে ওঠে শিক্ষার্থীদের বানানো কাগজের তৈরি সাদা সারস পাখিতে। আগারগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা সাদা সারস দিয়ে জাদুঘর প্রাঙ্গণ সাজিয়ে আণবিক বোমার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করা কিশোরী সাদাকো সাসাকিকে স্মরণ করে।

হিরোশিমা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা পাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্বাগত ব্যক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কেন হিরোশিমা দিবস পালন করে, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী এটি বুঝতে হবে, যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ লগ্নে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ঘটে তার সাথে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের তুলনা করা যায় না, তবে কোথাও একটা সামঞ্জস্য আছে। তিনি বলেন, এর চাইতে অমানবিক কিছু হতে পারে না যে, একটি মারণাস্ত্রকে পরীক্ষা করার জন্য দুটি শহরকে বেছে নেওয়া হলো, ৩ লাখ মানুষকে বেছে নেয়া হলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আশা করা হয়েছিল এই অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যাবে, হানাহানি বন্ধ হবে, সেটি হয়নি। ২০১৭ সালে পারমানবিক অস্ত্র নিষ্ক্রিয়করণের বৈশ্বিক উদ্যোগ নেয়া হয়। বর্তমানে অনেক রাষ্ট্র এই চুক্তির আওতায় এলেও অনেক দেশ আসেনি। অনেক রাষ্ট্র পারমানবিক অস্ত্র রাখছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শান্তি ও সম্প্রীতির আদর্শে বিশ্বাস করে। আমাদের দেশের নতুন প্রজন্মকে সহিংসতার বিরুদ্ধে একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়বার জন্য প্রত্যয়ী করা, আগ্রহী করাই এই আয়োজনের লক্ষ্য। এটি যদি পুরণ হয় তবেই হিরোশিমা দিবস পালনে যৌক্তিকতা থাকবে।

উপস্থিত শিক্ষার্থীদের সাদাকো সাসাকির কাহিনী পাঠ করে শোনায় শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা

৩ এর পৃষ্ঠায় দেখুন

৪৪তম নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলন

ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণির জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ডিজিটাল কন্টেন্ট নির্মাণ

নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ডিজিটাল কন্টেন্ট নির্মাণের লক্ষ্য নিয়ে গত ২২ জুলাই ২০২৩, ৪৪তম নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনের আয়োজন করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন ২০ জন নেটওয়ার্ক শিক্ষক যারা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে বাংলা বা সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদান করেন অথবা যারা আইসিটি শিক্ষক। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় শিক্ষক সম্মিলন শুরু হয় পরিচয় পর্বের মধ্য দিয়ে।

পরিচিতি পর্ব সমাপনান্তে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যবস্থাপক (শিক্ষা ও প্রকাশনা) সত্যজিৎ রায় মজুমদার সম্মিলনের বিষয়বস্তু সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির বাংলা, ইতিহাস এবং সামাজিক বিজ্ঞান গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির উপযোগী মুক্তিযুদ্ধের স্মারক, ছবি এবং বিভিন্ন দলিল শিক্ষকদের সামনে উপস্থাপন করেন। এখানে সপ্তম শ্রেণির বাংলা গ্রন্থের শওকত ওসমান রচিত তোলপাড় গল্প থেকে ইতোপূর্বে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তৈরি শরণার্থীদের ভিডিও ফুটেজ সমৃদ্ধ ডকুমেন্টারি, ষষ্ঠ শ্রেণির সমাজ বিজ্ঞান বইয়ে আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়ের জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মিত অপর দুটি প্রামাণ্যচিত্র 'অনেক কথার একটি কথা' ও 'আমার দেশের লাগি' প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া বিগত ৩টি নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনে প্রাপ্ত শিক্ষকদের পরামর্শ অনুসারে ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা থেকে জাহানারা ইমাম ও শহিদ রুমিকে নিয়ে তৈরি নতুন ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রদর্শন করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন. জাদুঘরের সাথে শিক্ষার একটা সম্পর্ক সবসময়েই থাকে সব দেশে। আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যক্রমে এই সম্পর্ক নিবিড় নয় এবং জাদুঘর পরিদর্শন করাও পাঠক্রমে বা শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু বাংলাদেশ তো একটি ব্যতিক্রমী দেশ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন, স্মারক, অসংখ্য বধ্যভূমি সবকিছু মিলিয়ে ইতিহাস বাংলাদেশের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। শিক্ষার সাথে ইতিহাসের যে সংযোগ তা গড়ে তুলতে সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়েও বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তবে শুধু নীতি নির্ধারণ করলেই হবে না, সেটা বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদ সমাজের। আবার নীতি নির্ধারণ হলেই যে বাস্তবায়ন হয়ে যাবে এমনটা নয়, নীতি বাস্তবায়নেও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন আছে। এক্ষেত্রে তিনি মনে করেন শিক্ষকরা বিশাল ভূমিকা পালন করতে পারে। সম্প্রতি ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণির বইয়ে যে পরিবর্তন আনা হলো, তা কেবল পাঠ্য বইয়ে পরিবর্তন না, পঠন-পাঠন এবং দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন এসেছে যা শিক্ষকরাই ভালো জানেন। তাই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কয়েকধাপে শিক্ষকদের নিয়ে আলোচনা সভার মাধ্যমে এ বিষয়ে জেনেছে বুঝেছে। পাঠক্রমে মুক্তিযুদ্ধ যেভাবে, শিক্ষক সহায়িকায় যে দিক নির্দেশনা আছে, শিক্ষকরা যেভাবে সেটা বাস্তবায়ন করছে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এখানে একটা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে শিক্ষকদের নেতৃত্বে, শিক্ষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে। যদি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক তথ্য এবং দলিলপত্র ব্যবহার করে কার্যকর পাঠ সহায়ক কন্টেন্ট তৈরি করা যায়, তার আবেদন অনেক বেশি হবে। তবে তিনি উল্লেখ করেন যে, চলমান শিক্ষাবর্ষে অনেকদিন পাঠদান হয়ে গেছে, মুক্তিযুদ্ধের অংশেরও পাঠদান প্রায় শেষ পর্যায়ে, কিন্তু আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এটি কাজে লাগবে। তাই কার্যকর কন্টেন্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মতামত, পরামর্শ জাদুঘরের একান্ত কাম্য। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যেটা করতে পারে তা হলো পুরো পাঠ্যবই বা কারিকুলাম নয়, কিছু কিছু অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত কিছু স্মারক-উপকরণ জাদুঘরে আছে, সেই স্মারক-উপকরণগুলো ব্যবহার করে কন্টেন্ট তৈরি করতে পারে, কিন্তু কন্টেন্ট তৈরির পদ্ধতি এবং উপস্থাপনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরামর্শ দেবেন শিক্ষকরা। এটি সম্ভব হলে কারিকুলামের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হবে। আমরা একটা অসীম সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি, জাদুঘরের সাথে শিক্ষার যে সংযুক্তি আর এই সংযুক্তি আজকের বাংলাদেশের যে বাস্তব পরিবর্তন হয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে সেটাকে অগ্রসর করে এগিয়ে যাবে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী বলেন যে, আমি শিক্ষালাভ করেছি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বিশেষ করে যখন কোনো পরীক্ষা এসেছে জীবনে। কোনো কোনো পরীক্ষা থাকে শুধু আমার পরিবারের, কিছু পরীক্ষা আসে সমাজের, কিছু পরীক্ষা আসে সারা দেশকে আলোড়িত করে। এমন একটি পরীক্ষা বাংলাদেশের মানুষকে দিতে হয়েছিল একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর চেয়েছে এই যে জাতীয় জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা জাতি লাভ করেছে এর সাথে বর্তমান প্রজন্মকে কীভাবে যুক্ত করা যায়, কীভাবে তাদের ইতিহাসটা জানানো যায়, কারণ মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তাদের ঋণ আছে। বাংলাদেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে সবচেয়ে গৌরবের, সবচেয়ে বীরত্বের ডিফাইনিং ফ্যাক্টর। এর থেকে যদি শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করে তবে সে দেশপ্রেমিক নাগরিক হবে, দেশের মানুষকে ভালোবাসতে শিখবে। বাংলাদেশ সরকার এবং শিক্ষামন্ত্রণালয় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনছে শিক্ষাক্ষেত্রে, আর তা হলো কেউ যেন মুখস্থ করে লিখে পাশ না করে, সে যেন হাতে-কলমে কিছু শেখে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলে শিক্ষার্থীরা যে কোনো বিষয়কে নিজের ভেতরে ধারণ করতে পারবে, লালন করতে পারবে। আরো ভালো হয় যদি এটি তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে ডিজিটাল কনটেন্টের মধ্য দিয়ে দেয়া হয়। এ কাজটিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আপনাদের সহায়তা করতে পারবে।

এরপর শিক্ষকবৃন্দকে ৪টি গ্রুপে ভাগ করা হয়, প্রতিটি গ্রুপ ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রসঙ্গে তাদের মতামত প্রদানের জন্য দলগত কাজে নিয়োজিত হন। একটি গ্রুপ ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা, একটি গ্রুপ ষষ্ঠ শ্রেণির সমাজ বিজ্ঞান এবং অপর দুটি গ্রুপ সপ্তম শ্রেণির বাংলা ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাণের জন্য সুপারিশমালা তৈরি করেন, যা দলগত কাজ শেষে প্রতিটি দল উপস্থাপন করে।

কীভাবে তথ্য-প্রযুক্তিকে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় সে প্রসঙ্গে মতামত প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক আবু সাঈদ। তিনি বলেন শিক্ষকদের পরামর্শ নিয়ে বইকে এ্যাপে কনভার্ট করা যায়, এতে করে খুব সহজে এ্যাপের মধ্য দিয়ে লেসনগুলো, বিভিন্ন ভিডিও শিক্ষার্থীরা পাবে, ফলে সে বাসায় বসেও পার্টিসিপেটরি কাজটা করতে পারবে। পাশাপাশি তিনি মনে করেন ক্লাসে কোন শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে যুক্ত করতে না পারলে, শিক্ষকের পাঠদান ব্যর্থ হয়।

সমাপনী বক্তব্যে সত্যজিৎ রায় মজুমদার বলেন, সারাদিনে শিক্ষকরা যে পরামর্শ দিয়েছেন তা গুরুত্বপূর্ণ। আগেও আপনাদের মূল্যবান মতামত আমরা পেয়েছি। আজ যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ড. আবু সাঈদ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন এভাবে আরও অনেক অভিজ্ঞজন আমাদের এই কাজে সম্পৃক্ত হবেন। আশা করি আমরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাণে একটা ভালো ফলাফল দিতে পারবো।

শান্তির সপক্ষে আমরা

২-এর পৃষ্ঠার পর

উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রী ফাহমিদা আক্তার নিহা ও সাথিয়া বিনতে জামান। বাংলাদেশস্থ জাপানি দুতাবাসের চার্জ দা অ্যাফেয়ার্স মি. মাচিদা তাৎসুয়া ১৯৯৯ সাল থেকে প্রতি বছর হিরোশিমা দিবস পালন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। জাপান এবং বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষীক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পালন করছে এবং দুটি দেশই বিশ্বশান্তি রক্ষায় ভূমিকা রাখছে উল্লেখ করে তিনি বলেন এই আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে উপস্থিত শত শত শিক্ষার্থী সাদাকোর কথা জানছে, তার কষ্টের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছে। এই একাত্মতা যে কারো দুঃসময়ে খুব বেশি প্রয়োজন। এই সংহতি মানুষকে সাহস এবং শক্তি দেয়। এই একাত্মবোধ নিয়েই দুটি দেশ কাজ করে যাবে, যা ভবিষ্যতে শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গঠনে ভূমিকা রাখবে। পরের পর্বে ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিশু-কিশোররা হিরোশিমা দিবস উপলক্ষে সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে। শুরুতেই মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরি ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করে "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী/ নিত্য নিঠুর দ্বন্দ/ বিকশিত কর প্রেমপদ্ম/ চির মধুনিষ্যন্দ/ করুণাঘন ধরনীতল/ কর কলঙ্কশূন্য, তাদের পরবর্তী পরিবেশনা ছিল আমরা হিংসা চাইনা/ চাইনা ধ্বংস/ চাই শুধু একটি সুখী শান্তিপূর্ণ বিশ্ব। এরপর মঞ্চে ভাষানটেক স্কুল এ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা নিজেদের রচিত সঙ্গীত 'আজ বন্ধু ৬ আগস্ট/ তোমরা জানো কি পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সাদাকো সাসাকোকে স্মরণ করে। তারা আরো পরিবেশন করে সংকেটর বিহ্বলতা নিজেরই অপমান ..., ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি ..., যুদ্ধ নয় শান্তি চাই, সবশেষে পরিবেশন করে বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি ...।

এই আয়োজনের পাশাপাশি হিরোসিমা পিস মেমোরিয়াল মিউজিয়ামের সহযোগিতায় পোস্টার এবং নওয়াজেশ আহমেদের ধারণকৃত আলোকচিত্রের সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশস্থ জাপানি দুতাবাসের চার্জ দা অ্যাফেয়ার্স মি. মাচিদা তাৎসুয়া।

হিরোশিমায় নির্মিত সাদাকো সাসাকির ভাস্কর্যে খোদিত বাণীর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলি 'এই আমাদের উচ্চারণ/ এই আমাদের প্রার্থনা/ বিশ্বজুড়ে নেমে আসুক শান্তি'।

-রনিকা ইসলাম, কর্মকর্তা, আউটরিচ

ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত এশিয়া জাস্টিস এ্যান্ড রাইটস-এর ট্র্যানজিশনাল জাস্টিস কোর্সের অভিজ্ঞতা

এশিয়া জাস্টিস এ্যান্ডস রাইটস (আজার) গত ২৪-২৮ জুলাই আয়োজন করে ট্র্যানজিশনাল জাস্টিস কোর্স ইনোভেশন এ্যান্ড ইমার্জিং বেস্ট প্রাক্টিসেস ফর এ্যাকাউন্টিবিলিটি এ্যান্ড পিস ইন এশিয়া-প্যাসিফিক। শুরুতেই এই কোর্সে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে মনোনীত করায় শ্রদ্ধেয় ট্রাস্টিবৃন্দ ও সদস্য সচিবকে ধন্যবাদ জানাই। এবারের এই কোর্সে বাংলাদেশ, মিয়ানমার, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম স্বাধীন দেশ- তিমুর-লেস্টে এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে মোট ২৭ জন অংশগ্রহণ করে। ভিসা জটিলতায় দেরি হওয়াতে বাংলাদেশিরা একদিন পরে অংশগ্রহণ করে তাই আজারের প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিস্টার প্যাট্রিক বার্জেস ২৯ জুলাই বাংলাদেশীদের সাথে একটি বিশেষ সেশন আয়োজন করেন।

২৫ জুলাই আজার লার্নিং সেন্টারে রাইটস টু ট্রুথ এ্যান্ড ট্রুথ মেকানিজম ও জেন্ডার পার্সপেক্টিভ নিয়ে হাওয়ার্ড ভার্নে এবং গালু ওয়ান্দিতা পৃথকভাবে সেশন পরিচালনা করেন। বিকেলে গ্রুপ ভিত্তিক কাজের আগে ইমপিউনিটি অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি-লেড ট্রুথ সিকিং ইনিশিয়েটিভ নিয়ে সেশন পরিচালনা করা হয়, এই সেশনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নির্মাণের গল্পটিও তুলে ধরবার চেষ্টা করি।

২৬ জুলাই ডকুমেন্টেশন এ্যান্ড মেমোরিয়ালাইজেশন: প্রিজার্ভিং দ্যা মেমোরি নিয়ে সেশন পরিচালনা করেন সিসিলিয়া জিমিনেজ-ডাম্বারই এবং 'স্টেট এ্যাকাউন্টিবিলিটি: লেসনস ফরম নেপালস' নিয়ে আলোচনা করেন মন্দিরা শর্মা। দুপুরের সেশনের পর বিকেলে আমরা সবাই একটি ফিল্ড ভিজিট করি। যেখানে গিয়ে বালি, ইন্দোনেশিয়ার ১৯৬৫ সালের ঘটে যাওয়া এক কালো ইতিহাস 'তামান-৬৫' সম্পর্কে বিস্তারিত এক পরিবারের পক্ষ থেকে জানতে পারি। মূলত কমিউনিস্ট মতাদর্শ থাকায় কীভাবে অত্যাচার, নিপীড়নের শিকার হয়েছে এই পরিবার এবং এখনও কীভাবে আগুঙ পরিবার 'তামান-৬৫' ঘটনার স্মৃতি ধরে রেখেছেন, সে বিষয়ে নানানভাবে জানা গেছে।

২৭ জুলাই ব্যারিস্টার প্যাট্রিক বার্জেস প্রসিকিউশন ফর ম্যাস হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন অ্যান্ড এ্যাকাউন্টিবিলিটি সেশন পরিচালনা করেন। এই সেশনে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীর বিচার নিয়ে সংগঠিত ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুন্যাল, বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং এর ভূমিকা ও তাৎপর্য বিস্তারিতভাবে জানতে পারি। ইন্ট্যারন্যাশনাল কাস্টমারি ল' (আর্টিকেল ৩৮, স্টাচুট অভ ইন্ট্যারনাশনাল কোর্ট)-এর ভিত্তিতে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল, বাংলাদেশ-এর গঠন নিয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করি। সেশন শেষে ২৫ মার্চ, ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যৌথ আয়োজনে বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতি আদায়ের অনুষ্ঠানে দেয়া প্যাট্রিক বার্জেসের বক্তৃতার স্মারক হস্তান্তরের সময় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও ট্রাস্টি মফিদুল হককে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের, সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের (সিএসজিজে) বাংলাদেশের গণহত্যা স্বীকৃতির জন্য তরুণ গবেষকদের ভূমিকাকে সাধুবাদ জানান।

২৮ জুলাই ট্র্যানজিশনাল জাস্টিসের চতুর্থ স্তম্ভ গ্যারান্টিজ অব নন রিকারেন্স নিয়ে সেশন পরিচালনা করেন ইন্দিরা ফারনিদা এবং ইতিমধ্যেই পূর্ববর্তী সেশনগুলোতে ট্রুথ সিকিং, জাস্টিস, রেপারেশন নিয়ে আলোচনা করার পর পোস্টার প্রেজেন্টেশন করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আমাদের সঙ্গে ছিলেন মিয়ানমারের জাস্টিস মিনিস্টার, সে পরিপ্রেক্ষিতে রোহিঙ্গা পরিস্থিতি ও মিয়ানমারের পদক্ষেপ নিয়েও আলোচনা করা হয়। এক পর্যায়ে আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভার্চুয়াল ট্যুর ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করি। এরপর প্যাট্রিক বার্জেসের গিটারের ছন্দে সবাই একসাথে গেয়ে ওঠি, What we want, What we need is JUSTICE, JUSTICE.

২৯ জুলাই শুধু বাংলাদেশী অংশগ্রহণকারীদের সাথে বিশেষ সেশনে এশিয়া জাস্টিস অ্যান্ড রাইটস (আজার)-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও ব্যক্তি হিসেবে প্যাট্রিক বার্জেসের ৩৪ বছর ধরে বিশাল কর্মযজ্ঞের ইতিহাস আমাকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করে। প্যাট্রিক বলেন, এবারের কোর্সটি তার কাছে 'ওয়ান অব দ্যা বেস্ট'। এই পাঁচ দিনের এই দারুণ অভিজ্ঞতা আমি মনে রাখতে চাই অনেক দিন। সেশন শেষে

আড্ডা, বালি সমুদ্রের ভেসে ওঠা ঢেউ কিংবা অনেক রাত হয়ে গেছে তবু তিমুর-লেস্টের সংগ্রামের গল্প এবং মিয়ানমারের অংশগ্রহণকারীদের ইতিবাচক ভাবনা অথবা জন লেননের গান একসাথে গেয়ে ওঠা সবাইকে আমার মনে থাকবে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসও উঠে এসেছে বারবার আলোচনায়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রাক্তন সহকর্মী হাসান মাহমুদ অয়ন ও সিএসজিজে ভলান্টিয়ার লুৎফুন্নাহার সঞ্চি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠার নেপথ্যের নানান গল্প আলোচনা করলে সবাই অভিভূত হয় এবং অংশগ্রহণকারীরা অনুপ্রাণিত হয়। ইন্দোনেশিয়ার চমৎকার আতিথেয়তা ও অসামান্য হৃদ্যতা, রাত জেগে পোস্টার সাজানো এখনও মনে পড়ছে।

এই দারুণ ও অমূল্য অভিজ্ঞতা আমার জীবনে চলার পাথেয় হয়ে থাকবে। তাই আরো একবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

হাসিবুল হক ইমন
সমন্বয়কারী, আইটি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

জল্লাদখানায় শহীদ সন্তানের স্মৃতিকথা

'আমার বাবা শহীদ আশ্রাব আলী দেওয়ান যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে পরিবারের সকলকে নিয়ে মিরপুর আমিন বাজারে বড় বোনের বাড়িতে আশ্রয় নেন। কিছুদিন সেখানে থাকার পর তিনি পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য মিরপুরের নিজ বাড়িতে আসেন। নিজ বাড়িতে তার কয়েক বস্তা ধান ও কয়েকটি গরু ছিল। সেগুলো তিনি বিক্রি করে আবার পরিবারের কাছে ফেরত যান। এভাবেই কাটছিল আমাদের দিন। একদিন তিনি গরুর দুধ বিক্রি করে আমাকে পোলাও খাওয়ানোর জন্য চাল কিনে এক দূর সম্পর্কের ভাইকে দিয়ে পাঠান। সেদিনই আমার বাবা শহীদ আশ্রাব আলী দেওয়ানকে পাকবাহিনী আরও অনেকের সঙ্গে গুলি করে হত্যা করে। লোক মারফত আমরা জানতে পারি বাবার লাশ এই জল্লাদখানায় এনে ফেলা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের পরিবার অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়ে। যদিও আমাদের অনেক জমিজমা ছিল কিন্তু আত্মীয়-স্বজনদের সহযোগিতার অভাবে সেগুলোও হাতছাড়া হয়ে যায়।' স্মৃতিকথাগুলো শোনাচ্ছিলেন শহীদ আশ্রাব আলী দেওয়ান-এর আদরের কন্যা ফাতেমা বেগম। সামনে উপস্থিত জান্নাত একাডেমী হাই স্কুলের শিক্ষার্থীবৃন্দ। নতুন প্রজন্মের সামনে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও গণহত্যার ইতিহাস তুলে ধরতে দীর্ঘ দুই যুগের বেশি সময় ধরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মিরপুরস্থ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠেও রয়েছে এমন কিছু নিয়মিত কর্মসূচি যার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, গণহত্যার ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে বাঙালিসত্তা ও নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বিভৎসতা অনুভব করতে পারে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৩ জুলাই ২০২৩ আয়োজন করা হয় এই স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান। আরো স্মৃতিচারণ করেন শহীদ আব্দুল হাকিমের পুত্র আব্দুল হামিদ। ১৯৭১ সালে মিরপুর গণহত্যায় নির্মমভাবে শহীদ হন তার বাবা আব্দুল হাকিম। স্মৃতিকথা শোনান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ কামরুল ইসলাম খান। জান্নাত একাডেমীর সিনিয়র শিক্ষক আশ্রাফুন্নেসা পারুল শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আগামীদিনে দেশ ও জাতিকে রক্ষার জন্য শপথ নেয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠান শেষে ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থী মাকসুদা আক্তার জান্নাত জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠে রাখা মন্তব্য খাতায় লেখে, 'শহীদ সন্তানদের কাছ থেকে তাদের বাবা সম্পর্কে অনেক স্মৃতি আমরা শুনলাম। শুনে খুব খারাপ লেগেছে আমার। আমরা আজ স্বাধীন হয়েছি তাদের বাবাদের প্রাণের বিনিময়ে। সেই সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। আশা করি আমি বাংলাদেশের জন্য আগামীতে উন্নত অবদান রাখবো।'

এভাবেই জল্লাদখানার গণহত্যার ইতিহাস ও মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে পারে নতুন প্রজন্ম। জল্লাদখানার গণহত্যার ইতিহাসের পাশাপাশি জল্লাদখানা প্রাঙ্গণে খোদাই করা ৪৭৭ টি বধ্যভূমির নাম, বিশ শতকে সমগ্র বিশ্বের গণহত্যা সম্পর্কেও তাদের ধারণা হয়। সমগ্র বাংলাদেশই যে একটা বধ্যভূমি তারা এটা উপলব্ধি করতে পারে। বলা বাহুল্য যে, ২০০৭ সাল হতে চলমান এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী সংখ্যা ২০ হাজারেরও অধিক। এভাবেই এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্ম গণহত্যার ঘটনা ও ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানার পথ তৈরী হচ্ছে।

প্রমিলা বিশ্বাস
সুপারভাইজার, জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

শ্রদ্ধাঞ্জলি | মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিভাষ্য: সদ্যপ্রয়াত কণ্ঠযোদ্ধা বুলবুল মহলানবীশ

আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম তাঁদের সবার কাছে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়াটা আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ। ১৯৭১-এর ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে যাব বলে আমাদের পাড়ার মেয়েদের একটা বিশাল বড় দল গঠন করেছিলাম আমি। কিন্তু মাম্পস হয়ে যাওয়ার কারণে আমি যেতে পারলাম না। আমার বাবা ও বড়ভাই গেলেন রেসকোর্সে। আমি সারাদিন ধরে কান্নাকাটি করলাম। আমি পালিয়ে রেসকোর্স চলে যাবো এই ভয়ে আমার বাবা আমার দরজায় শিকল লাগিয়ে গিয়েছিলেন। দুপুরের পর থেকে আমি রেডিও ধরে বসে থাকলাম কিন্তু হঠাৎ করে দেখলাম ঢাকার রেডিও স্টেশন বন্ধ হয়ে গেল। বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক অঙ্গনের যারা নেতৃবৃন্দ ছিলেন তাদেরকে ডেকে মিটিং করে বললেন তোমরা বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ নামে একটা সংগঠন করো যেটা বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করবে। এটার আহবায়ক হয়েছিলেন সৈয়দ হাসান ইমাম। যুগ্ম আহবায়ক ছিলেন ওয়াহিদ ভাই। শহীদ মিনারে সকাল ১০টা থেকে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হতো সন্ধ্যার পর ৮টা সাড়ে ৮টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলতো। যেহেতু আমার মাম্পস হয়েছিলো আমার পনেরদিন ঘরে থাকার কথা। কিন্তু আমি ১৩ তারিখে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলাম। সেই সময়ে যে গানটা গাইতাম একক কণ্ঠে এবং সম্মিলক কণ্ঠেও গাইতাম সেটা হচ্ছে 'ওরে মাঝি দে নৌকা ছেড়ে দে'। গানটা লিখেছিলেন শহীদ সাবের এবং সুর করেছিলেন আমার শিক্ষক শেখ লুৎফর রহমান। বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের এই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিলো সম্ভবত ৯ই মার্চ থেকে। ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় শাঁখারীবাজার, তাঁতীবাজার, বাংলাবাজার তারপরে বায়তুল মোকাররমে স্টেজ করে অনুষ্ঠান করতাম। আমি মূলত অনুষ্ঠান করতাম শহীদ মিনারে।

২৫ মার্চ দুপুর পর্যন্ত আমরা অনুষ্ঠান করেছি। দুপুরের পরে হাসান ভাই ও যারা নেতৃস্থানীয় ছিলেন তারা বললেন শহরের অবস্থা ভালো লাগছে না তোমরা বাসায় চলে যাও। বিশেষ করে মেয়েদেরকে বললেন। আমরা বাসায় ফিরে এলাম তখন বোধহয় আড়াইটা বাজে। রাত প্রায় ১১টা সাড়ে ১১টার দিকে দেখলাম হঠাৎ করে কয়েকজন ছুটে এসে খবর দিলো গোলাগুলি হচ্ছে। আমরা কিছুক্ষণ পর দেখলাম আকাশে লেলিহান শিখা। আমরা হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। দাদু বাবাকে ডেকে বললেন যে তোমাদের এইখানে থাকাটা ঠিক হবে না। তারপরে আমরা নরসিংদী চলে গেলাম। ৩০ মার্চ গিয়ে পৌঁছলাম। এপ্রিল মাসের ৪ তারিখে নরসিংদীতে বোম্বিং করা হলো। আমরা যে বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলাম সেটা ছিলো তখনকার বিডি মেম্বার সুরেন দাসের বাড়ি। আমি তখন দোতলায় বসে রেডিও শুনছিলাম। আকাশবাণী কলকাতা, আকাশবাণী আগরতলা, রেডিও অস্ট্রেলিয়া থেকে যুদ্ধের খবরগুলো পাচ্ছিলাম। আমার মা, কাকীমা, দিদিমাসহ সব মেয়েদেরকে নিয়ে ঢালু একটা জায়গায় নিচু হয়ে কানে হাত দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম।

মে মাসের ১ তারিখ আমরা যখন আগরতলা সীমান্ত পার হলাম তখন দেখেছি অনেক সংগঠন শরণার্থীদের জন্য কাজ করছে। আমরা কিছুদিন পরে আগরতলা থেকে প্রথম বহরমপুর গেলাম তারপরে গেলাম মধ্যপ্রদেশে। তারপরে আমরা ফিরে এসছি কলকাতায়। কলকাতায় আমার মামা বাড়ীতেই ছিলাম। হঠাৎ করে আমার মামা একটা পত্রিকা এনে দেখালেন যে 'মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা' নামে একটা সংগঠন তৈরি করা হয়েছে সেখানে বাংলাদেশের যারা শিল্পী আছেন তাদের যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। আমি পরদিনই যোগাযোগ করলাম ১৪৪ লেনিন সরণিতে। আমি যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছলাম তখন ওয়াহিদ ভাই আমাকে বললেন 'ও তুমি বুলবুল, খোকাদা আমাকে বলে দিয়েছেন তোমার কথা'। সেই সময় শাহীন আপা, কল্যাণীদি, রথীনদা, রফিক ভাই, বেনু ভাই এবং আরও অনেকেই ছিলেন। বেনু ভাই মূলত আমাদের গানগুলো শিখাতেন। রূপান্তরের গান বলে একটা গীতি আলেখ্য আমরা করতাম বিভিন্ন জায়গায়। সেখানে শাহরিয়ার কবির কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলা থেকেই আমার অনেক পরিচিত একজন বড় ভাই। ওদেরকে দেখে মনে হয় আমার প্রাণে পানি পেলাম। 'মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'র যে গীতি আলেখ্যটা লেখা হয়েছিল সেখানে অধিকাংশই ছিলো কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান। পূজা পর্যায়ের গান ছিলো, স্বদেশ পর্যায়ের গান ছিলো। একটা গান আমার হঠাৎ মনে পড়ছে। ওই পোহাইল তিমির রাতি। তারপরে অনেক গান যেমন কাজী নজরুল ইসলামের 'এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল' এই গানটা আমরা 'কারার ঐ লৌহ কপাট'-এর সাথে মিক্সড করে গাইতাম। ধারাবর্ণনা অনেক সময় হাসান ভাই পড়তেন অনেক সময় আলী যাকের পড়তেন। আমরা বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করেছি। আমি বেশিদিন মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থার সাথে যুক্ত ছিলাম না। আমি, কল্যাণীদি, রফিক ভাই, রথীনদা আমরা কিন্তু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলাম। ওয়াহিদ ভাইয়ের কাছ থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ঠিকানাটা পেলাম। পরদিন আমি গেলাম। যাওয়ার পর দেখি রথীনদা ঢুকছেন। রথীনদা তো ঢুকে গেলেন আমাদের তো দারোয়ান আটকে দিয়েছে কারণ আমাদেরকে চেনে না। আমার পাশ দিয়ে এক ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন তার হাতের সিগারেটের খালি প্যাকেটটা ফেলে দিবেন বলে। আমি জানতাম লোহানী ভাই ওখানে আছেন। আমি লোহানী ভাইয়ের কাছে চিঠি লিখলাম। তারপরে আমাকে ঢুকতে দেয়া হলো, লোহানী ভাই বললেন পাশের বাড়িতে সমরদা অজিতদারা রিহার্সেল করাচ্ছে তুমি ওখানে চলে যাও। তখন পাশের বাড়িতে ছাদের ওপরে রিহার্সেল হতো। ওখানে গিয়ে দেখি রিহার্সেল হচ্ছে। অজিতদা, সমরদা আমাকে দেখে হই হই করে উঠলো। তখন দেখলাম কল্যাণীদি, রথীনদা, অরূপ রতন চৌধুরী, তপন মাহমুদ, উমা চৌধুরী, মান্না হক এরা সবাই আছেন। আরও অনেকে আছে সকলের নাম হয়তো এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। গোবিন্দ হালদারের লেখা যে গানটি আমরা প্রপার ইন্সট্রুমেন্টে রেকর্ড করেছিলাম সেই গানটা অত্যন্ত জনপ্রিয় গান সবারই জানা। 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য্য উঠেছে রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল'। এই গানটা ছিলো নঈম গহরের লেখা। সুর করেছিলেন সমর দাস। একদিন আমি গেট দিয়ে ঢুকছি দেখলাম লোহানী ভাই, অজিতদা, সমরদা, পটুয়া কামরুল হাসান এরা সবাই গেটের সামনে দাঁড়ানো। তাদের প্রত্যেকের মুখ থমথমে। আমি বুঝতে পারছি না কি ঘটনা ঘটলো। আমি কামরুল ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম আপনাদের মুখ এমন থমথমে কেন? উনি বললেন আলতাফ ভাই আর নেই। আমি বললাম আলতাফ ভাই নেই মানে! কোন আলতাফ ভাই? উনি বললেন শিল্পী আলতাফ মাহমুদ, আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারির আলতাফ ভাই।

১৬ ডিসেম্বর আমি যখন বেতার কেন্দ্রে ঢুকলাম গিয়ে দেখি মিষ্টি বিতরণ হচ্ছে। দেখলাম অনেকেই আছেন সুজেয় দা, শহীদুল ইসলামও আছেন। শ্যামদা হারমোনিয়াম দিয়ে সুর তুলছেন। অজিতদা বসে আছেন অজিতদার লিড ভয়েজ যাবে। আমরা কয়েকজন আছি যারা গানটা গাইবো। গানটা হলো– 'বিজয় নিশান উড়ছে ঐ খুশির হাওয়ার উড়ছে, উড়ছে উড়ছে উড়ছে বাংলার ঘরে ঘরে। মুক্তির আলো ওই ঝরছে।' আমাদের গানটা তৈরি হতে মাত্র কুড়ি থেকে বাইশ মিনিট সময় লেগেছিলো লেখা, সুর করা এবং শেখা। এটা একটা অকল্পনীয় ব্যাপার। আমাদের উদ্দীপনাটা এমনই ছিলো।

(মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গবেষণা কাজে 'আর্কাইভ ও ডিসপ্লে টিম'-এর তত্ত্বাবধানে 'শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্র' কর্তৃক ১১ মার্চ ২০২১ ধারণকৃত সাক্ষাৎকারের চুম্বকাংশ)

আইএজিএস বার্সেলোনা সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিনিধিত্ব

১ম পৃষ্ঠার পর

তাদের প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। অন্য আরেকটি প্যানেলে ড. হেলেন জারভিসের সভাপতিত্বে গবেষণা পত্র উপস্থাপন করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ড. নাভরাস আফ্রিদি এবং সিএসজিজে'র সমন্বয়ক ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির অব প্রফেশনাল্‌সের আইনের শিক্ষক ইমরান আজাদ। এই প্যানেলের বিষয়বস্তু ছিল "থ ার্ড ওয়ার্ল্ড রেজিস্টেন্স এগেইনস্ট দ্য পলিটিক্স অব জেনোসাইড এন্ড ইট্‌স ডিনায়াল"। 'ড্রাফটিং দ্য ইউএন জেনোসাইড কনভেনশন অব ১৯৪৮: মারজিনালাইজড ভয়েস অব এ উমেন ফ্রম বেঙ্গল এন্ড দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মফিদুল হক আর ইমরান আজাদ 'জেনোসাইড ডিনায়াল ইন দ্য পোস্ট-১৯৭১ বাংলাদেশ: ইটস পলিটিক্যাল ট্রেন্ডস এন্ড দ্য লেসনস ফর ডেমোক্রেসি' বিষয়ে। অধ্যাপক ড. নাভরাস আফ্রিদি অনলাইনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন 'দ্য এবিউজ অব হলোকাস্ট মেমোরি ইন ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান' বিষয়ে। প্রশ্নোত্তর পর্বের মধ্য দিয়ে এই প্যানেলটি সমাপ্ত হয়।

সম্মেলনের অনানুষ্ঠনিক বিভিন্ন আলোচনায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ জেনোসাইডের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য জোর দাবি জানানো হয় এবং এ সংক্রান্ত জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত ফ্লাইয়ার/প্রকাশনা সম্মেলন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এক আলোচনায় জাতিসংঘের স্পেশাল এডভাইজার অন দ্য প্রিভেনশন অব জেনোসাইড এলিস ওয়াইরিমু নিরেতু ২০১৯ সালে তার বাংলাদেশ সফর বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন ও বাংলাদেশে হেট স্পিচ নিরোধে জাদুঘর কর্তৃক নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা করেন। আরেক আলোচনায় ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক বেন কিয়ারনান বাংলাদেশ জেনোসাইড নিয়ে তার গবেষণার আগ্রহের কথা প্রকাশ করে জানান যে, ২০২৩ সালের মে মাসে প্রকাশিত তিন খণ্ডের 'কেমব্রিজ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি অব জেনোসাইড'-এর সর্বশেষ খণ্ডে বাংলাদেশ জেনোসাইড নিয়ে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্যারি জে ব্যাসের একটা প্রবন্ধ তিনি তার সম্পাদিত বইয়ে ছাপিয়েছেন। জার্নাল অব জেনোসাইড রিসার্চের এডিটর-ইন-চিফ ডার্ক মোজেস জানান, ২০১১ সালের ১৩নং ভলিউমে বাংলাদেশ জেনোসাইড ও পরবর্তী বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে একটা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয় ।

সম্মেলনের শেষের দিন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে মফিদুল হক সিএসজিজে'র বাংলাদেশ ও রোহিঙ্গা জেনোসাইড সংশ্লিষ্ট প্রকাশনার সৌজন্য সংখ্যা বার্সেলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ লাইব্রেরিতে হস্তান্তর করেন।

আইএজিএস বার্সেলোনা কনফারেন্সের পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানসূচি পাওয়া যাবে conftool.com/iags2023/sessions.php এই ঠিকানায়। আইএজিএসের ২০২৫ সালের সম্মেলনটি আয়োজন করবে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্য জোহানেসবার্গ হলোকাস্ট এন্ড জেনোসাইড সেন্টার।

- সিএসজিজে

বিশেষ তথ্যচিত্র প্রদর্শনী

হাসিনা: এ ডটার্স টেল

একজন দুহিতা বলছেন তার বাবার কথা, মায়ের কথা, ভাইয়েদের কথা, হঠাৎ একরাতে ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে পুরো পরিবার হারানোর যন্ত্রণার কথা। তথ্যচিত্রের দর্শকদের কাছে এটি কোন পরিবারের কাহিনী হয়ে থাকে না, বরং হয়ে ওঠে একটি জাতির সর্বোচ্চ গ্লানির ইতিহাস, বিষাদময় আখ্যান। আটচল্লিশ বছর আগের সেই অধ্যায় জানছে তার অনেক পরে জন্মগ্রহণ করা, বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা। পিতার আদর্শ ধারণ করে পিতার স্বপ্নগুলো বাস্তবায়নে এক কন্যার লড়াই তারা জানছে। তথ্যচিত্রের নাম 'হাসিনা: এ ডটার্স টেল'। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদৎ-বার্ষিকী স্মরণে গত ১২ আগস্ট ২০২৩ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করে সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন (সিআরআই) প্রযোজিত এবং পিপলু খান নির্মিত তথ্যচিত্র 'হাসিনা: এ ডটার্স টেল'-এর বিশেষ প্রদর্শনী। প্রদর্শনীতে আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস ও ব্রাইট স্কুল এন্ড কলেজের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি মফিদুল হক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, চলচ্চিত্রের একটি শক্তিশালী ভাষা আছে। এই চলচ্চিত্রটি মুক্তিযুদ্ধের পরের প্রজন্মের জন্য তৈরি। তরুণ প্রজন্মের যে সদস্যরা আজকে এই চলচ্চিত্রটি দেখলো, তারা নিশ্চই এটি নিয়ে ভাববে। তিনি বলেন, আমাদের দেশ অনেকটা এগিয়ে গেছে, তবে অশুভ শক্তির শংকাও রয়েছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য সফল হতে দেয়া যাবে না, এজন্য তরুণ প্রজন্মকে সচেতন থাকতে হবে। তথ্যচিত্রটির নির্মাতা পিপলু খান শিক্ষার্থীদের সাথে ছবিটির নানান দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, দশ বছর আগে ছবিটি বানানোর কাজ শুরু করেন তিনি। এখানে বঙ্গবন্ধু এবং তার কন্যা শেখ হাসিনা কোথাও যেন এক হয়ে গেছেন। শিক্ষার্থীদের তিনি বলেন. বাংলাদেশেকে বাংলাদেশের মানুষেরই সহযোগিতা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের অনুভূতিতে জানা যায়, তারা অজানা অনেক তথ্য জানতে পেরেছে, অনেকের মনে আগ্রহ জন্মেছে বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান টুঙ্গীপাড়া দেখতে যাবার।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশের আদর্শিক

১ম পৃষ্ঠার পর

রাজনীতি করার সুযোগ দেয়া হয়। পুনর্বাসিত এই দালালরা এরপর দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত আসামি ও বিদেশে অবস্থানকারী দালালদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি উত্থাপন করে। বস্তুত জিয়াউর রহমানের শাসনামলের শেষ দিকে সংসদের বাইরে স্বাধীনতা বিরোধীদের ব্যাপক উত্থান, শাহ আজিজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিএনপিতে স্বাধীনতা বিরোধী অংশ শক্তি অর্জন করে, পিকিংপন্থীরা কোনঠাসা হয়ে পড়ে। নতুন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার ছিলেন পাকিস্তানপন্থি ও শাহ আজিজ গ্রুপের সমর্থক। পরবর্তীতে পাকিস্তান প্রত্যাগত জেনারেল এরশাদও একই ধারায় স্বাধীনতা বিরোধীদের পুনর্বাসনকারী। ১৯৭৫-৭৯ পর্যন্ত পার্লামেন্ট নয়, ফরমানের আদেশ বলে সংবিধান কাটা ছেঁড়া করা হয়। জেনারেল জিয়া ভারত ও আওয়ামী বিরোধী ও ধর্মভিত্তিক দলগুলোর সমর্থন লাভের জন্য সংবিধানে ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। ১৯৭৮ সালে সংবিধান সংশোধন করে সংবিধানের সূচনায় সংযোজন করা হয় 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম' এবং ১৯৭২ সালের সংবিধানের চার মূলনীতির জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস সংযোজন করা হয়। এরশাদ রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণা করেন। তার ব্যক্তিজীবন, আদর্শহীন রাজনীতি নিয়ে বিতর্ক সত্ত্বেও তিনি ধর্মকে ক্ষমতায় থাকার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেন। এছাড়া সংবিধানের ২য় ভাগের ২৫ অনুচ্ছেদে সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলা হলেও ১৯৭৮ সালে "রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করতে সচেষ্ট হইবেন" সংযোজন করে।

১৯৭৯ সালের সংসদ অধিবেশন শুরু হলে অধিবেশনের শুরুতে মুজিব আমলের কোরআন, গীতা, বাইবেল, ত্রিপিটক পাঠের বদলে শুধু কোরআন পাঠের ব্যবস্থা রাখা হয়। এ নিয়ম বজায় রাখা হয় রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানেও।

জিয়ার আমলে ধর্মভিত্তিক দলগুলো জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্তন করা ছাড়াও ইসলামিক প্রজাতন্ত্র কায়েম ও সংবিধান পরিবর্তনের দাবিতে সংসদ ও সংসদের বাইরে সোচ্চার ছিল।

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পট পরিবর্তনের পর প্রথম বক্তৃতায় খন্দকার মোশতাক পশ্চিমা বিশ্ব ও পাকিস্তানসহ মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ দেখান। মুজিব আমলে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে যে মানসিক দূরত্ব ছিল, মোশতাক ও জিয়ার আমলে সেই দূরত্ব কমে আসে। এ সময় বাংলাদেশ সরকারের রুশ-ভারত বিরোধী পররাষ্ট্রনীতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রতি আগ্রহ, সর্বোপরি, মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে সংবিধানে ধারা সংযোজন করা হয়। বিভিন্ন মুসলিম দেশ বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক দলগুলোর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী তৎপরতা চালায়। কেউ কেউ জঙ্গীবাদে অর্থায়ন করে। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে স্বীকৃতি না দিলেও মোশতাক আমলের শুরুতেই চীন, সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

অর্থনৈতিক পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার আগেই বিভিন্ন সময়ে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রীয় মূল নীতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। বৃহৎশিল্প, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সরকারি মালিকানাধীনে এনে তা জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়। তাঁকে হত্যার মাধ্যমে তা সম্পূর্ণ উল্টো পথে পরিচালিত হয়। বঙ্গবন্ধুর জাতীয়করণ কর্মসূচি হুমকির সম্মুখীন হয়। প্রায় ৫০০ শিল্প ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের যারা রাষ্ট্রের মালিকানাধীনে এসেছিল তাদের শ্রমিকদেরও অনিশ্চিত জীবনের দিকে নিয়ে যায়। সংবিধানের মূলনীতি থেকে সমাজতন্ত্র বাদ না দিলেও এর সঙ্গে জুড়ে দেয় নতুন বাক্য "অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার।" জিয়ার শাসনামলে শুরু হয় জাতীয়করণ প্রতিষ্ঠানের বিরাষ্ট্রীয়করণ এবং গড়ে তোলা হয় নতুন ব্যবসায়ী ও লুটেরা শ্রেণি।

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর শিক্ষা ক্ষেত্রেও বিপর্যয় নামে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু বরাবর গণশিক্ষা, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতেন। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত কুদরত ই খুদা শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদনে শিক্ষাক্ষেত্রে ৪ মূলনীতির প্রতিফলন, সর্বস্তরে বাংলা মাধ্যম চালু, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা এবং অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অভিন্ন শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

তবে কমিশন বাস্তবায়নের পূর্বেই রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে শামসুল হকের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়ন কমিটি ৫ম শ্রেণি থেকে ধর্ম শিক্ষা অবশ্য পাঠ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করে। ১৯৭৭ সালে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচি ও সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যসূচিকে সমপর্যায়ে নিয়ে আসার প্রস্তাব করে। তৎকালীন জিয়া সরকার তা এড়িয়ে ধর্মভিত্তিক দলগুলোকে সন্তুষ্ট করতে ১৯৭৬-৭৭ এবং ১৯৭৮-৭৯ শিক্ষা বর্ষে কয়েকটি সাধারণ শিক্ষার বিষয় ও বিজ্ঞান বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে আলিম ও ফাযিল পর্যায়ে নতুন পাঠ্যসূচি চালু করে।

পরিশেষে তিনি বলেন, ৭৫ পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশে, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ সকল ক্ষেত্রে '৭১ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার যে চেষ্টা হয়েছে তা বাঙালি প্রতিহত করেছে। কিন্তু পাকিস্তানি ভূত ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশের ষড়যন্ত্র অব্যাহত আছে। তরুণরা অতীতের মতো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বড় সহযাত্রী। তাদের বয়সে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন, মধ্য বয়সে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছেন। ত্রিশ লক্ষ শহীদের বাংলাদেশ কখনো এর সৃষ্টির লক্ষ্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে বিচ্যুত হবে না। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ও সোনার মানুষ হয়ে বাংলাদেশ গড়তে পারলে আর কখনো কেউ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনষ্ট করতে পারবে না, এ আদর্শের পরিবর্তনও করতে পারবে না।

ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশ ইনডিপেনডেন্স রান ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

প্রভাতের প্রথম সূর্য কিরণের দেখা পাবার আগেই পৌঁছে যাই হাতিরঝিলের অ্যাম্ফিথিয়েটারের উদ্দেশে Inspiring Bangladesh Independence Run-এ অংশগ্রহণ করার জন্য। এর আগে বেশ কয়েকবার দৌড়ের আয়োজনে এখানে আসলেও এবারের অংশ-গ্রহণ আমার জন্য বিশেষ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের হয়ে দৌড়ানোর সৌভাগ্য হওয়াটা আমার জন্য আনন্দের এবং গর্বের।

২১ জুলাই দৌড় অনুষ্ঠিত হলেও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে দৌড় নিয়ে উৎসবের আমেজ তৈরি হয়েছিল কয়েকদিন আগেই। এই আয়োজনে ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশের সহোযোগিতায় ছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। সংবাদ সম্মেলনে টি-শার্ট উন্মোচন করা, রেজিস্ট্রেশনকৃত দৌড়বিদদের কিট বিতরণ করার দিনগুলোতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর হয়ে উঠেছিল দৌড়বিদদের মিলন মেলা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টিবৃন্দ সবসময়ই চান তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যেন বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সথে যুক্ত থাকে।

যথাসময়ের কিছু বিলম্বে দৌড় শুরু হয়। তিন ক্যাটাগরির (১৫ কিলোমিটার, ৭.৫ কিলোমিটার ও শিশুদের দৌড়) দৌড়ের আয়োজনে শতশত মানুষের ঢল দেখে যে কারো মনেই তারুণ্যের শক্তি জেগে উঠবে। শিশু-কিশোর, তরুণ-বৃদ্ধ সকল বয়সী মানুষের ঢল নেমেছিল যেন সেদিন। আয়রনম্যান শামসুজ্জামান আরাফাত, টেন মিনিট স্কুলের আয়মান সাদিক, মুনজেরিন শহীদসহ পরিচিত অপরিচিত হাজার মুখ।

বাংলাদেশে কয়েকবছর যাবত দৌড়ের আয়োজন প্রশংসনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে দৌড়বিদের সুবিধা সবার আগে বিবেচনা করা হয়। ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশের এত সুন্দর আয়োজন কয়েকটা ভুলের কারণে দৌড়বিদদের কাছে আদর্শ আয়োজনের আবেদন রাখতে ব্যর্থ হয়। জুলাই মাসের গরমে দৌড়ের আয়োজন করে রানিং ট্রাকে পর্যাপ্ত পানির অভাব এবং ইমার্জেন্সি মেডিকেল সাপোর্ট না থাকাটা অত্যন্ত বিপজ্জনক রূপ নিতে পারতো। আশাকরি পরবর্তীতে আয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এসব বিষয়ে গুরুত্ব দেবেন।

দৌড়ের এই আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সহযোগী হিসেবে থাকলেও স্পন্সর প্রতিষ্ঠানের লোগোর ভিড়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের লোগো কোথাও চোখে পড়েনি। প্রথমে ভেবেছিলাম এ হয়তোবা আমারই দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা, কিন্তু অনেক খুঁজেও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে কোথাও খুঁজে পাইনি। কিট কালেকশনের দুইদিনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহযোগিতা স্পন্সর প্রতিষ্ঠানের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় বলে মনে করি। এই আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সম্পৃক্ত হয়েছিল জাদুঘরের স্থায়ী তহবিল গঠনে অনুদান সংগ্রহের উদ্দেশে। আশা করা যায় এই আয়োজনের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের তরুণ-বৃদ্ধ সকল বয়সের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ লাভ করি। স্বাধীনতার ২৫ বছর পর ১৯৯৬ সালে ৮ জন তরুণ প্রাণের নিরলস প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। আমরা যারা তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা আছি আমাদের উচিত মুক্তিযুদ্ধকে জানা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানা, নিঃস্বার্থভাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে গিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বেলিত হওয়া। আমাদের কার্যক্রমে কোনোভাবেই যেন মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন না হয়।

ইয়াছমিন লিসা

জাদুঘরের মন্তব্য খাতা থেকে

২১.০৭.২০২৩

আমি ভারতের কলিকাতা থেকে এসছি, পল্লব সেন। এই মিউজিয়ামে অনেক অমূল্য জিনিস আর ছবি সংরক্ষিত আছে যা আমাদের ঠাকুরদার জন্মের সময় কালের। বই বা তাদের মুখে অনেক কথা শুনেছি বা জেনেছি, এখানে এসে আরও অনেক কিছু দেখলাম, জানলাম। দেখে খুব আপ্লুত হলাম।

পল্লব সেন

২২.০৭.২০২৩

কি লিখব? আমি যতই দেখছি, যত জানছি ততই আমার হৃদয়ে শিহরণ জেগে উঠছে। বিশেষ করে শরণার্থী শিবির নিয়ে যে গ্যালারি আছে তার দৃশ্য এবং করুণ মিউজিক আমাকে হতবুদ্ধি করেছে। আমার মনে দাগ কেটেছে। অন্যান্য উপকরণ, দৃশ্য, পত্রিকা কাটিং মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশকে জানতে সাহায্য করেছে।
I Love Bangladesh, I love my history, my earnest people who died for the Country.

Md. Harun-or-Rashid
Muladi, Barishal

২৪.০৭.২০২৩

মনের মধ্যে অনেক ভাবনা আসছে। তবে হ্যাঁ সেই সময় আমার জন্ম হলে আমি অবশ্যই দেশের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তাম। ভালবাসি বাংলাদেশকে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেওয়া প্রতিটা মানুষকে। এখানে এসে নতুন করে অনেক কিছুর স্মৃতিচারণ হলো। বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

রুবিনা খাতুন,
চুয়াডাঙ্গা

২৫.০৭.২০২৩

প্রজেক্টের কাজে এখানে এসেছিলাম। ৫ দিন ধরে সম্পূর্ণটা ঘুরে যে তথ্য ও জ্ঞান সংগ্রহ করলাম সেটা আমার জন্য খুব আনন্দের। বাঙালির ইতিহাস নিয়ে বরাবর আগ্রহী ছিলাম। এখানে এসে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস থেকে শুরু করে 'বাংলাদেশ' নামে একটি রাষ্ট্রের জন্ম সব জানতে পারলাম। কত ত্যাগের বিনিময়ে আমরা আমাদের দেশকে পেয়েছি তা জেনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সকল মানুষ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি শ্রদ্ধা ও সন্মান অনেক বেড়ে গেলো। নিজেকে আজ বাঙালি বলে গর্ব অনুভব করছি। এই জাদুঘর থেকে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে যাচ্ছি তা আমার আগামী দিনের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্ব পালনে আমাকে উদ্বুদ্ধ করবে।

মরিয়ম আক্তার
শিক্ষার্থী
ঝিনাইদহ

২৬.০৭.২০২৩

জাদুঘর জাতির শিকড়কে চেনার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্যকে জানতে বুঝতে হলে জাতির যুব সমাজকে আরো বেশি জাদুঘরের সাথে সম্পৃক্ত করার গুরুত্ব অপরিসীম। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সেই মহতী কাজকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

মো. ওবায়দুল্লাহ আল মামুন
সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

০৮.০৮.২০২৩

It felt like a journey through our own liberation struggle... from colonial times of the anwal of the Dutch East India Company in 1692... The wars of resistance by the people of South Africa to the liberation struggle waged and directed by the African National Congress (ANC) my organization and all other liberation movements. To the liberation culminating to the 1994 Freedom Day. I am moved to ask the question when shall we the people of South Africa write the memory of the liberation struggle and when shall we have a museum the same as I have witnessed today in Dhaka, Bangladesh. It was an emotional journey yet healing and hoping, so no not hoping --- But working towards peace, security and stability and ensuring what we saw of history today --- Never repeats itself.
Thank you to all the people and generations who sacrificed for today's Bangladesh.

Lindue Zulu
Minister of Social Development
South Africa

বিশেষ অতিথিদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

২৪ জুলাই ২০২৩ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন ভুটানের শিক্ষাবিদ ও সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ঠাকুর এস পাওডিয়েল

২৮ জুলাই ২০২৩ বাংলাদেশস্থ মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির এফটিসি ব্যাচের ১৫৮ জন প্রশিক্ষণার্থী ৩১ জুলাই ২০২৩ মুক্তিযুদ্ধ জদুঘর পরিদর্শন করেন

২ আগস্ট ২০২৩ আমেরিকান প্যাসিফিক এয়ারকম্যান্ডের প্রধান এবং উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাসহ ২০ জন কর্মকর্তা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

৩ আগস্ট ২০২৩ বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)-এর ১২জন কর্মী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রী Ms. Lindiwe Zulu MP সফরসঙ্গীদের নিয়ে ৮ আগস্ট ২০২৩ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

আগামীর আয়োজন

প্রখ্যাত ভারতীয় তথ্যচিত্র-নির্মাতা কৃষ্ণেন্দু বোস-এর গবেষণা, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র 'বে অব ব্লাড' বিশ্বব্যাপী প্রদর্শনের সূচনা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আগামী ১৯ আগস্ট ২০২৩, শনিবার, বিকেল চারটায় জাদুঘর মিলনায়তনে বাংলাদেশে প্রথম প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। প্রামাণ্যচিত্রে একাত্তরের গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী বয়ান এবং আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের মূল্যায়ন স্থান পেয়েছে।

১৮ আগস্ট ২০২৩ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস আয়োজিত মাসব্যাপী ১২তম সার্টিফিকেট কোর্সের উদ্বোধন হবে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official